Sanatan Dharma

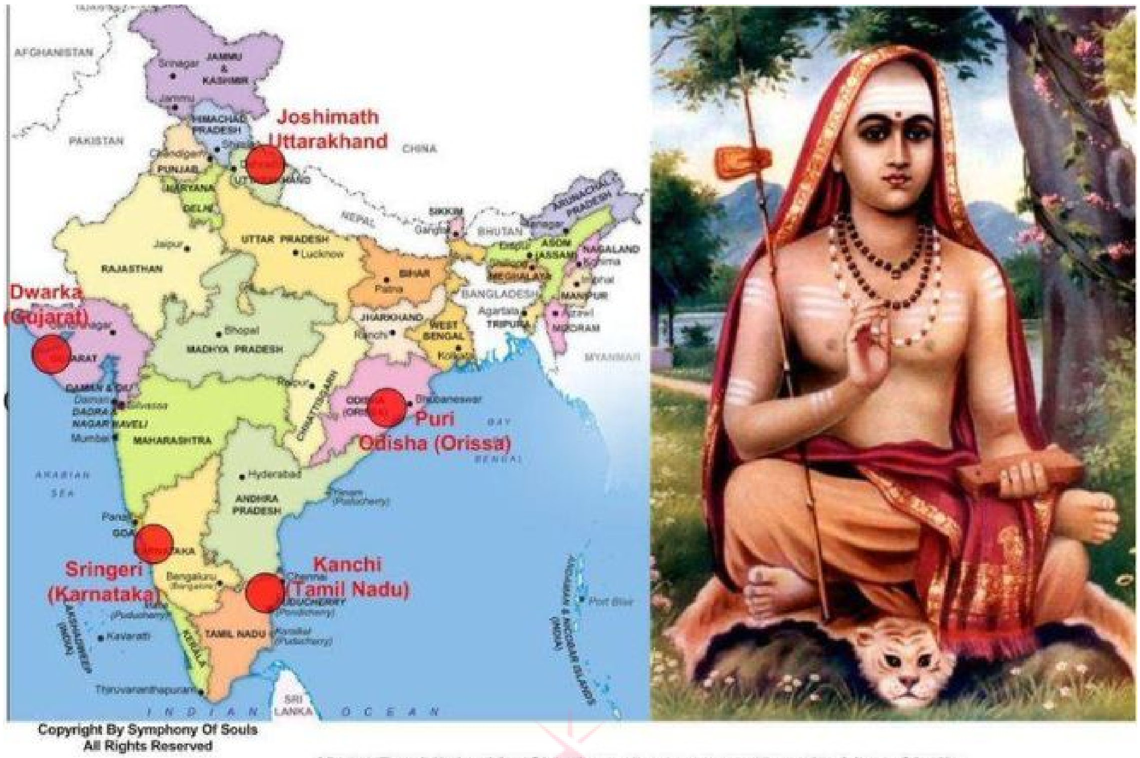

Mutts Established by Shankaracharya strengthen the Idea of India

আচার্য শঙ্কর

বিভিন্ন মত এবং পথে শতধা বিভক্ত সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। সনাতন ধর্ম শাশ্বত এবং ঈশ্বর প্রবর্তিত একমাত্র মুক্তির পথ। চিরকালই এ ধর্ম ছিল আছে এবং থাকবে। এর কোন বিনাশ নেই কারণ ঈশ্বর স্বয়ং এ ধর্মের প্রবর্তক এবং রক্ষাকর্তা। তাইতো যুগে যুগে এ ধর্ম কখনো সঙ্কুচিত অথবা কখনো প্রসারিত অবস্থায় থাকে। এমনি এক সঙ্কুচিত ঘোর দুর্দিনে ভগবানের দিব্য ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ কণা নিয়ে আমাদের মাঝে আসেন এবং আলোর পথ দেখান শ্রীপাদ্ শঙ্করাচার্য। তাঁর জন্ম ৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে কেরালা প্রদেশের ‘কালাডি’ নামক একটি ছোট্ট গ্রামে। পিতা শিবগুরু এবং মাতা বিশিষ্টা দেবী।

জন্ম থেকেই অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা এবং ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন আচার্য শঙ্কর। মাত্র তিন বছর বয়সেই তিনি তাঁর মাতৃভাষা মালয়ালাম পড়া-লেখার দক্ষতা অর্জন করেন। এর ধারাবাহিকতায় তাঁর বয়স যখন সাত বছর তখন তিনি বেদবেদান্তসহ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এবং ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার যা শুনতেন পরক্ষণেই তার অবিকল বলে দিতে পারতেন।

সনাতন সত্য ধর্মের বিজয় পতাকা দিকে দিকে উড্ডীন করার জন্যে আচার্য শঙ্কর হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন। পূর্বে কামরূপ (আসাম), ঢবাক (ঢাকা) থেকে পশ্চিমে গান্ধার (আফগানিস্তান) এবং দক্ষিণে তামিলনাড়ু থেকে উত্তরে তিব্বত সর্বত্র তিনি প্রচার করে বেড়িয়েছেন বৈদিক ধর্মদর্শন। বৈদিক সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত এবং ঈশ্বরই ছিল তাঁর

Published on: Mar, 22 2023 11:36

জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা।

সম্রাট অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজকোষ শূন্য করে দিয়ে বৌদ্ধমত প্রচারের নেশায় পাগলপ্রায় হয়ে যান। তিনি যুবসমাজকে কর্মবিমুখ সন্ন্যাসের পথে প্রোৎসাহিত করেন। তিনি সৈন্যবলকে অসার ধর্মবলে রূপান্তরিত করেন। এর ফলে ভারতবর্ষের বিদেশী শক্তির প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং ভারতবর্ষ পরিণত হয় দুর্বলচিত্ত ক্লীবের দেশে। ভারতবর্ষের সাথে যুগপৎ সনাতন বৈদিক ধর্মেরও এক মহাসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। নাস্তিক বৌদ্ধ মত এদেশকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, বৈদিক ধর্মের প্রাণকেন্দ্র কাশী বেনারস, (উত্তর প্রদেশে) পর্যন্ত নাস্তিক মতে ম্রিয়মান হয়ে যায়। জনশ্রুতি আছে কাশী তখন পূজার অভাবে গোচারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এমনি বীভৎস সময়ে ধূমকেতুর মত আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি বিভিন্ন নাস্তিক এবং অবৈদিক অপসম্প্রদায়গুলোকে স্তব্ধ করে দিয়ে সত্য সনাতনের চিরন্তন পথে আমাদের প্রবুদ্ধ করেন।

সনাতন ধর্ম পঞ্চমতে বিভক্ত- সৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য এবং বৈষ্ণব। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ পঞ্চ মতাবলম্বীরা নিজেদের মাঝে সর্বদাই সাম্প্রদায়িক কলহে লিপ্ত থাকত। এ গুরুতর সমস্যা সমাধানে অগ্রনায়ক হলেন আচার্য শঙ্কর। তিনিই প্রথম সার্বজনীন উপাসনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং সব দেবতার পূজার আগে পঞ্চমতের প্রতিনিধিত্বকারী পঞ্চদেবতার (সূর্য, শক্তি, শিব, গণেশ, বিষ্ণু) পূজার বিধান দান করেন। এ বিধান প্রাচীনকালেও ছিল কিন্তু মাঝে অবলুপ্ত হয়ে যায়। আচার্য পুনঃ এ বিধান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃঘাতী হিংসা-হানাহানী বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আমাদের পূজায় ব্যবহৃত অধিকাংশ পদ্ধতিই তাঁর নির্দেশিত। আধুনিক হিন্দু জাতিকে প্রথম একটি সাংগঠনিক রূপ দেন শঙ্করাচার্য। তিনিই প্রথম সনাতন ধর্ম রক্ষায় সংঘের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেন। অবশ্য সংঘের ধারণা প্রাচীনকাল থেকে ছিল কিন্তু তা ছিল বিচ্ছিন্ন, অপূর্ণাঙ্গ এবং প্রয়োগহীন। তাঁর প্রবর্তিত সংঘই ধর্ম রক্ষায় একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ প্রতিষ্ঠানই 'শঙ্কর মঠ' নামে আমাদের কাছে পরিচিত। 'শঙ্কর মঠ' কোন একক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে ভারতবর্ষের চারপ্রান্ত থেকে চারটি মঠের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এ চারটি মঠ ছিল সনাতন ধর্ম রক্ষায় চারটি দুর্গের ন্যায়। সিন্ধু, সৌবীর, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য শারদা মঠ; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল, গৌড়, সুক্ষ্ম, পৌন্ড্র, ব্রহ্মপুত্র তীরবাসীসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের জন্য গোবর্দ্ধন মঠ; কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কম্বোজসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলের জন্য জ্যোতি মঠ এবং অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের জন্য শৃঙ্গেরী মঠ। শঙ্করাচার্য এ চার মঠের আচার্য হিসেবে নিযুক্ত করেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম চার শিষ্যকে সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটক এবং হস্তামলক। এ চার আচার্য চার মঠ থেকে চার বেদের পূর্ণাঙ্গ বৈদিক জীবন বিধানের শিক্ষা দিতে থাকেন দিকে দিকে। ফলে সনাতন ধর্ম একটি সুদূর সাংগঠনিক রূপ পায়।

শঙ্করাচার্য অধ্যাত্ম পথের পথিক এবং সাধারণ গৃহীদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষা দানের জন্য চার মঠের অন্তর্ভূক্ত একদল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন যারা 'দশনামী সন্ন্যাসী' সম্প্রদায় নামে খ্যাত। ফলে ভারতবর্ষে তৈরি হয় শক্তিশালী এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ধর্মীয় মত, পথের সংগঠন এ চারমঠ এবং দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সাথে কোন না কোনভাবে যুক্ত। সন্ন্যাসীর আত্মপরিচয় এই পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের বিবরণ থেকে জানা যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' শঙ্করাচার্যের শৃঙ্গেরী মঠের অধিভূক্ত একটি স্বতন্ত্র

প্রতিষ্ঠান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রাণপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গদেব দুজন গুরুর কাছে মন্ত্রদীক্ষা এবং সন্ন্যাস নিয়েছিলেন; তাঁরা হলেন শ্রী ঈশ্বরপুরী এবং শ্রী কেশব ভারতী। তাঁরা দুজনেই শৃঙ্গেরী মঠভূক্ত সন্ন্যাসী। এমনকি যে নামে শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদের মাঝে খ্যাত ‘শ্রীচৈতন্য’; এই ‘চৈতন্য’ নামটি শৃঙ্গেরীমঠভূক্ত ব্রহ্মচারী উপাধি। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যও শঙ্করাচার্যের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত সন্ন্যাসী।

শঙ্করাচার্য তাঁর বত্রিশ বছরের সামান্য আয়ুতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত এখনো পর্যন্ত ১৫১ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে বেদ এবং বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য গ্রন্থের উপর ২২ খানা। এ ২২ খানা ভাষ্যগ্রন্থের মধ্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে ধরা হয় ‘ব্রহ্মসূত্র’ ভাষ্য’কে। এ সূত্র ভাষ্যতেই তিনি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিস্থাপিত করেন। আত্মতত্ত্ব এবং প্রকৃত বৈদিক জীবন লাভের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক আদেশ, উপদেশ এবং প্রকরণ গ্রন্থের সংখ্যা ৫৪ খানা। দেবদেবীদের স্তবস্তুতিমূলক গ্রন্থ ৭৫ খানা। প্রচলিত অধিকাংশ স্তব স্তুতিই এ গ্রন্থগুলি থেকে নেয়া। অসাধারণ তার ধ্বনিমাধুর্য এবং অসাধারণ তার পদলালিত্য।

আচার্যের জীবনের একটি প্রধান কীর্তি হল শ্রেষ্ঠ পবিত্র মন্দিরগুলোতে ভগবদ্বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা। জগন্নাথ ধামে কালযবনের অত্যাচারকালে মন্দিরের সেবায়েত পাণ্ডাগণ জগন্নাথ বিগ্রহের উদর প্রদেশে স্থিত রত্নপেটিকা চিল্কা হ্রদের তীরে ভূগর্ভে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কালক্রমে উক্ত স্থানের লোকেরা ভুলে যান রত্নপেটিকা রাখার স্থানটিকে। আচার্য শঙ্কর যোগবলে জগন্নাথের রত্নপেটিকা রাখার স্থানটিকে নির্ধারণ করে দেন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। বদরিকাশ্রমে নারায়ণ বিগ্রহও তিনি অনুরূপভাবে প্রকাশিত করেন।

আচার্য শঙ্কর ছিলেন যুক্তিবাদিতার এক অত্যুজ্জ্বল বিগ্রহ। তিনি যুক্তিবিহীন কোন কথা বলতেন না। যে কথাই বলতেন তার পিছনে থাকতো তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি। সে অকাট্য যুক্তির জাল ছিন্ন করা ছিল দুঃসাধ্য। কারণ তিনি ছিলেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি যা বলেছেন তাই সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থান ঘটালেন শুধুমাত্র যুক্তি, মেধা, প্রজ্ঞার সহায়তায়। না কোন রক্তপাত না কোন হানাহানি, না কোন রাজশক্তির ক্ষমতার অপপ্রয়োগে। কোন কিছুই ধ্বংস করেন নি, করেছেন সৃষ্টি, পুনঃপ্রবর্তন। বশিষ্ট-ব্যাসের ন্যায় মেধা প্রজ্ঞার সাথে অসাধারণ সারল্য, লাবণ্য ছিল তাঁর সারা দেহে, তাই তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও শঙ্করাচার্যের কথা ভাবলে গা রোমাঞ্চিত হয়, ভাবি শঙ্করাচার্য কি একজন, না শত সহস্রজন! মাত্র বত্রিশ বছর, মহাকালের কাছে কতটুকু সময়! এ সময়ের মধ্যে একজন ব্যক্তি এত অসাধারণ কীর্তি কি করে করলেন; এই সামান্য সময়ের মধ্যে কিভাবে তিনি এত জনপদে ঘুরে বেরিয়েছেন; কি কৌশল অবলম্বন করে কোটি কোটি মানুষকে সনাতন ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে এসেছেন; এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিভাবে তিনি ১৫১টা অমূল্য গ্রন্থের রচনা করেছেন; এবং এত সুসংবদ্ধ, অনন্য, অভূতপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা তিনি কোথায় পেলেন?

শঙ্করাচার্যের সমতুল্য ব্যক্তি ভারতবর্ষে তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা শঙ্করাচার্যের যোগ্য উত্তরসুরি হতে পারিনি। আচার্যের জীবনে আমরা দেখি যা কিছু সনাতন ধর্মের সমৃদ্ধিবাচক কাজ হয়েছে তা তাঁর জীবৎকালেই হয়েছে। তাঁর অন্তর্ধানের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং

যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে চারমঠ আচার্যের জীবৎকালের ন্যায় নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার কারণেই অনন্য অসাধারণ কাজের পরেও আচার্য শঙ্করকে আমরা ভুলতে বসেছি। আজ শঙ্করাচার্যের উক্তি বিভিন্ন গুরু এবং গুরুরূপী ভগবানগণ (!) নিজেদের নামে চালিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। কারণ এ কুম্ভীলকদের ধরবে কে? এর জন্য আমরাও কম দায়ী নয়। যতদিন যাচ্ছে তত বেশি করে আমরা মূল বৃক্ষকে ছেড়ে শাখা প্রশাখায় যেয়ে বসছি এবং তাকেই মূল বৃক্ষ বলে অভিমান করছি। সনাতন বৈদিক রাজপথ ছেড়ে কতগুলো অপরিচ্ছন্ন অলিগলিতে যেয়ে পথহারা পথিক হয়ে বসে আছি। অলিগলিতে চলতে চলতে আমরা টেরও পাচ্ছি না যে আমরা পথহারা। ভগবানের অবতারের নামে হাইব্রীড ফসলে সারা দেশে ছেয়ে যাচ্ছে। ভণ্ড পাষণ্ড মিথ্যা অবতারদের কারণে সনাতন হিন্দু সমাজ নুয়ে নুয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য মত পথের জঞ্জালে আমাদের যুবকসমাজ পথহারা, ভ্রান্ত, বিপথগামী হয়ে সনাতন ধর্ম, সমাজ এবং পারিবারিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। পরিণামে কেউ হচ্ছে মানসিক হীনমন্য, কেউ বেছে নিচ্ছে ধর্মান্তর, কেউবা হয়ে যাচ্ছে ঘোরতর নাস্তিক।

আজ নিমজ্জমান হিন্দু জাতিকে রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শঙ্করাচার্যের ন্যায় তেজদীপ্ত নায়ক, সংগঠক এবং ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী মহামানবের। সেই পারবে হিন্দু সমাজের অনাকাক্সক্ষিত জঞ্জালকে বিদূরিত করে ঐক্যবদ্ধ সুসংবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে। নতুন এক সূর্যোদয়ের আকাক্সক্ষায় সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছি আমরা।

Published on: Mar, 22 2023 11:36